

সহীহ হাদীসের আলোকে সাওম বিশ্বকোষ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায়: সাওমের পরিচয়, ইতিহাস ও তাৎপর্য

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

সাওমের তাৎপর্য

সংযম অর্জন:

সাওমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে সংযম। মূলত সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সাওমের প্রচলন ছিল। ইসলামী শরী‘আতে ফরযকৃত সাওম সেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো সাওমের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে ব্রতী হওয়া।

আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমযান মাস হলো ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এ মাসেই আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যাতে রমযান পরবর্তী সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে, কথায় কাজে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই সাওম।

তাকওয়া অর্জন:

সাওমের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়া‘লা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ১৮৩]

[১৮৩]

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরাপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) যাতে তোমরা তাকওয়াবান হও। এখানেই সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাকওয়ার ভিত্তির ওপর যে সমাজ গঠিত হবে সেখানে থাকবে না কোনো হিংসা বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, দুর্নীতি ও রাহাজানি। সাওমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল প্রকার নাফরমানী কাজ থেকে দূরে থাকার নামই তাকওয়া। মানুষের মনের গোপন কোণে যে কামনা-বাসনা আছে, আল্লাহ তা‘আলা সে সম্পর্কেও জ্ঞাত। আল্লাহর কাছে বান্দার মান-মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র উপায় তাকওয়া। এ তাকওয়াই মানুষের মনে সৎ মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে। সুতরাং যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করতে পারলেই সাওম পালন সফল ও সার্থক হবে। এভাবে সাওম পালনের মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের একজন সৎ, আল্লাহভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকে হবে।

সাওম থেকে তাকওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাকওয়া অর্জন করার ক্ষেত্রে সাওমের কোনো বিকল্প নেই। সাওমের শিক্ষা নিয়ে তাকওয়ার গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করতে পারে। ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সাওম রাখলে জীবনের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ শিক্ষা যদি বাকি ১১ মাস কাজে লাগানো যেত, তাহলে পৃথিবীতে এত অশান্তি, অনাচার থাকত না। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“যে সংশোধিত হলো, সেই সফলকাম হলো”। [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪]

আত্মিক ও দৈহিক সুস্থতা অর্জন:

সাওম মানুষের ভেতর ও বাহির -দুই দিকের সংশোধন করে। মানুষের ভেতরের অবস্থা পরিবর্তন করা অর্থাৎ আলোকিত করা এবং তার স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ সংশোধনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা সাওমের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাওম মানুষকে পার্থিব লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়।

মানুষের শারীরিক অবকাঠামো ঠিক রাখতে বর্তমানে চিকিৎসকেরা সাওম রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। শরীর ঠিক তো মন ঠিক। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শারীরিক সুস্থতা অত্যাवশ্যকীয়।

ইবন সিনা সাওমকে দুরারোগ্য সব রোগের চিকিৎসা বলতেন। মিশরে নেপোলিয়ানের আগ্রাসন পরবর্তী যুগে হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য সাওম রাখতে বলা হতো।

সুন্দর সমাজ গঠন:

সাওমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভুক্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুধাবন করা যায়, ফলে সমাজে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। সাওম সাধনা সহমর্মিতা শিক্ষা জাগ্রত করার কার্যকর মাধ্যম। অনাহার কাকে বলে, খাদ্যাভাব কাকে বলে যারা অনুভব করে নি, তারা সমাজের বঞ্চিত ও পীড়িত মানুষের কষ্ট কীভাবে বুঝবে? সাওম রাখার কারণে এই মানুষগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণা সম্পর্কে সামান্য হলেও ধারণা পাবে। ফলে প্রতিবেশি ও কাছে অবস্থানকারীদের কষ্টের জীবন কিছুটা অনুধাবন করা সহজ হবে। সাওম রাখার কারণে শরীরের শক্তি কমে আসবে। তখন অধীনস্থদের কাজের ভার লাঘব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। আর এতে মনিব-ভূত্যের দূরত্ব কমে একে অপরের পরিপূরক মনে করার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে বৈরিতা থাকবে না।

সাওম পালনের দ্বারা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আন্তরিকতা, দানশীলতা, বদান্যতা, উদারতা, ক্ষমা, পরোপকারিতা, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি সদাচরণ জন্মায়। সাওমের এ মহান শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রমযান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বেশি দান সদকা করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে, ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন

তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।”[1]

তাই সাওম পালনের দ্বারা সমাজের দারিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। প্রকৃতপক্ষে সাওম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনসহ সর্বস্তরে অনুশীলনের দীক্ষা দিয়ে যায়। তাই আসুন, সাওমের প্রকৃত শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের প্রতি যত্নবান হয়ে সাওম পালনের মাধ্যমে নিজেদের মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করি, মানবিক গুণাবলিতে জীবনকে আলোকিত করি; তাহলে আমাদের সাওম সাধনা অর্থবহ হবে। তখন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে সুমধুর সম্পর্ক, বিদায় নেবে অরাজকতা, অন্যায়-অনাচার এবং দুর্নীতি ও ভেজালমুক্ত হয়ে আদর্শ জাতি হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। সাওমের মাসের পরিসমাপ্তি বয়ে আনুক সমাজ জীবনে আমূল পরিবর্তন, আল্লাহভীতি, আত্মসংযম ও মানবপ্রেম। সাওমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আলোকে যেন সারা জীবন সৎভাবে অতিবাহিত করে আল্লাহর অশেষ করুণা ও ক্ষমা লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের সে তাওফীক দান করুন। আমীন।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10826>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন